অষ্টম অধ্যায়
জীবনদর্শন

''কেন চলে যাব, কিছু কাজ আছে শুনেছি প্রভাতে
মাথায় পৃথিবী নিয়ে জন্মাবধি রয়েছে বাসুকি
আছড়ে ভাঙে নাই আজো।
বড় ভালো এই মাটি,
অক্ষয় চাঁদের নিচে অনন্ত ফোয়ারা,
মানুষের স্নান খেলা;
বড় ভালো হেসে ওঠা আঁধারে জ্যোৎস্নাময়
মানুষের পদশব্দ হয়ত বা শ্রেষ্ঠতম মধুর বেহালা''[১]

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ পাঠ করলে বুঝতে পারি তিনি শুধুমাত্র কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিকই নয়, তিনি ছিলেন একজন সত্যদ্রষ্টা দার্শনিক। তাঁর কবিতার প্রতিটি ছত্রে, নাটকের প্রতিটি চরিত্রের সংলাপে ও প্রবন্ধের বক্তব্যে রয়েছে গভীর মনন, বুদ্ধি ও দর্শনের ছোঁয়া। তাঁর নাটক রচনার পূর্বাপর ধারার কথা জানতে চাইলে তিনি জানান— তাঁর মানুষ সম্পর্কে কিছু বলার আছে। যা তাঁর শেষের দিকের নাটকে সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। যদিও সব নাট্যকারই তাঁর সৃষ্টিতে মানুষকেই দেখাতে চান, কিন্তু মোহিত চট্টোপাধ্যায় মানুষের কাছে যা চান, সেইভাবেই একটা খাঁটি মানুষকে অনুসন্ধান করেছেন, তাঁর নাটকে দেখিয়েছেন।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের জীবন মানেই নাটক, আর নাটক মানেই জীবন। তাই তাঁর নাট্যদর্শন ও জীবনদর্শন মিলেমিশে আছে। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর কাছে নাটক লেখা অনেকটা চশমার মতন। চশমা ছাড়া তিনি যেমন ঝাপসা দেখেন, অস্পষ্ট দেখেন, দূরের জিনিস দেখতে পান না, একটা অসহায়, বিপন্ন জীবন যাপন করেন, তেমনি লেখা তাঁর কাছে দৃষ্টির ন্যায়, লেখার মাধ্যমে পৃথিবীটা তাঁর কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি নিজেকে একজন medicore বা মাঝারি মানের লেখক বলতেন। আর তাঁর মতে পৃথিবী জুড়ে এই medicore লেখকদেরই ছড়াছড়ি। এই সংখ্যাতীত লেখকদের অবদান কম নয়। তিনি বলেছেন—

''... এঁরা প্রতিভাবানদের মতো সিংহাসনে বসার ক্ষমতা রাখেন না, রাজকীয় মুকুটটিও মাথায় রাখার অধিকার পান না। কিন্তু এঁরাই রাজত্বটা রক্ষা করে চলেছেন। প্রতিভাবানদের আবির্ভাব হয় কালেভদ্রে, শতাব্দীর পর শতাব্দীও পেরিয়ে যায় দিকপাল প্রতিভাবানদের আবির্ভাব ঘটতে। প্রতিভাবানদের উপস্থিতিহীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির যাত্রাপথে মাঝারি ক্ষমতার লেখকরাই সৃষ্টির ধারাকে ধরে রাখে। সৃষ্টির ভূমি অবিরাম কর্ষণের দায়িত্ব থাকে এঁদেরই ওপর। এঁরা কালজয়ী হন না কিন্তু এই অল্পায়ুদের চিতাভস্মই সৃষ্টির ক্ষেত্রকে উর্বর

করে রাখে।"[২]

এই অল্পায়ুদের মধ্যেই তিনি নিজেকে গণ্য করেন এবং এইভাবে নিজের লেখার তাৎপর্য খুঁজে পান। তিনি ছিলেন বাংলা নাটকের একজন স্বতন্ত্র শিল্পী। তিনি শুধুমাত্র নাটকই লিখতেন। তাঁর নিজস্ব নাট্যদল ছিল না এবং তিনি কোনদিন নাট্যনির্দেশনার সাথেও যুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন আত্মপ্রচারহীন, নির্লোভ, প্রচারের আড়ালে থাকা নাট্যকার। তাঁকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি চিরকালই আড়ালে থাকেন কেন? তিনি বলেছিলেন—

> ''একজন নাট্যকার তো ব্যাক স্টেজের লোক। অভিনেতারা সামনে আসেন কিন্তু নাট্যকার মঞ্চের পিছনে থাকেন। আমি আমার শিল্পকর্মের কারণেই ব্যাক স্টেজে বা আড়ালে থাকি। আমার শিল্পকর্মই আমাকে আড়ালে রেখেছে। তবে প্রয়োজনের ডাকে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেখানে সামনে আসার আমন্ত্রণ থাকে, দায়িত্ব থাকে সেখানে আমি সামনের সারিতেই থাকি। প্রয়োজনের তাগিদে সেখানে আমি ডাকলেও যাই, না ডাকলেও যাই।"[৩]

তিনি মনে করতেন নাটক মানুষকে কখনো বদলে দিতে পারে, কখনও আবার মানুষ নাটককে বদলে দেয়। নাটক মানুষের রুচিকেও বদলে দিতে পারে। তিনি কোন কিছু চেয়ে, দাবি করে নাটক লেখেননি বলে তাঁর নাটকের দ্বারা মানুষের কল্যাণ হলে তিনি খুশি হতেন। কিন্তু তিনি কোন কিছুর জন্য তেমন দুঃখিত ছিলেন না। বেঁচে থাকতে তাঁর ভালো লাগত আবার মরে যাবেন ভেবেও ততটা আতঙ্কিত ছিলেন না কখনো।

তিনি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবনা ও কথার স্বাতন্ত্র্যকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে লিখতেন। এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই তিনি কবিতা ও নাটক লিখেছিলেন। যেহেতু তিনি মানুষ হিসেবে কেবল তাঁরই মতো, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাই তিনি বলতেন তাঁরই মতো, আলাদা— প্রচলিত ধারার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গতানুগতিক প্রথাসর্বস্ব ধারার থেকে সরে এসে নিজস্ব পথে চলার তাড়নাই তাকে নিজস্ব পথে পরিচালিত করেছিল। এজন্য তিনি বলেছিলেন— "My theatre is a new knock on the door."[৪]

রিয়ালিস্টিক জীবনের পরিবর্তে শিল্পে তিনি ননরিয়ালিস্ট জীবন প্রকাশের পক্ষপাতী ছিলেন। আর এই কারণে তাঁর নাট্যজীবনে প্রথম পছন্দের মানুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি প্রচুর বিদেশী ও বাংলা নাটক অধ্যয়ন করে উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাংলা নাটক প্রধানত বাস্তবের নিয়মকানুন, বাস্তবিক ঘটনাবিন্যাস এবং বাস্তবের জীবনধারা অনুসরণ করে রচিত। তিনি মনে করতেন, 'সাজাহান' থেকে 'রক্তকরবী'তে পৌঁছোতে যে কোনও দেশের নাট্য আন্দোলনের একশো বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হওয়া দরকার। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে কাজ করে দেখিয়েছেন অনায়াসে। তাই তিনি বলেছেন—

> ''ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রতিভার সংঘাত হয় এবং প্রতিভা ঐতিহ্যের প্রথা ভেঙে নতুনকে আবিষ্কার এবং প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাবানের পক্ষে এ কাজ সহজেই ঘটতে দেখলাম।"[৫]

তাঁর মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন', 'তাসের দেশ' ইত্যাদি নাটকে বাস্তবতাকে ভেঙে রূপক-সংকেত-বিমূর্ততার প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা নাটকে একটা ভিন্নধর্মী স্বতন্ত্র নাট্যরূপ নির্মাণ করেছেন। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই নাটকগুলিতে বাইরের বাস্তব জীবনের পরিবর্তে অন্তর্গত বাস্তবতার প্রকাশ করেছেন। ফলে তাঁর নাটকের চরিত্রে একটা নতুন মাত্রা দেখতে পাই। নাট্যকার বলেছেন—

> ''ঘটনা চরিত্রের inner reality-কে প্রকাশ করার জন্য realistic treatment-এর পথ ছেড়ে abstraction, symbolic suggestive expression-কে গ্রহণ করেছেন।''[৬]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্প ও উপন্যাসে নয়, শুধুমাত্র নাটক ও ছবি আঁকাতে বাস্তবতা পরিত্যাগ করেছেন বলে তিনি মনে করেন।

রবীন্দ্রনাথের ছবি এবং প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলা, আধুনিক চিত্রকলা, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদির মধ্যেও বাহ্যিক বাস্তবকে ভেঙে অন্তর্লোকের বাস্তবতাকে ধরার একটা বিমূর্ততার প্রকাশ রয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথ নন-রিয়ালিস্টিক নাটক লিখেছেন, কেননা এর মধ্যে এক ধরনের স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়া যায়, যাকে তিনি বলেছেন, 'Creative freedom'। প্রচলিত চরিত্র, আঙ্গিকের নাটক যারা লিখেছেন তাঁরা বাস্তবের নির্দিষ্ট নিয়মেই ঘোরাফেরা করেছেন। বাস্তব চরিত্র, ঘটনা, আঙ্গিককে তারা অনুসরণ ও অনুকরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তিনি মনে করতেন যে কল্পনা, অন্তর্বাস্তবতা, বিমূর্ততা বা ছায়া বাস্তবতার মাধ্যমেই একমাত্র জীবনের সম্পূর্ণ সত্যকে তুলে ধরা সম্ভব। এই ধরনের সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমেই মৌলিক কিছু সৃজন করা সম্ভব। এই ধরনের সৃষ্টিতে লেখকের স্বাধীনতা এবং কল্পনার পরিসরও অনেক বেশি। এই ধরনের স্রষ্টাকে তিনি 'ঈশ্বরে'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। সৃষ্টি সুখের স্বাধীনতায় এখানে লেখক ঈশ্বরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি লেখেন, সৃষ্টি সুখের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে নিজের কল্পনাশক্তিকে তীব্র করে তুলতে।

এছাড়া তিনি মনে করতেন সব ধরনের লেখাতেই একটা দর্শন থাকে, একটা উদ্দেশ্য থাকে, যেটা লেখক, পাঠক ও দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে চান। তিনি একটি বিশেষ বক্তব্যকে, দর্শনকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য লিখতেন। তিনি মনে করতেন বাস্তবধর্মী নাটকে একটা সম্পূর্ণ মানুষকে পাওয়া যায় না। তিনি অধ্যয়ন করে দেখেছেন ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকারেরা বাস্তবতাকে বর্জন করে অবাস্তব প্রকাশ মাধ্যম খোঁজার চেষ্টা করছিলেন সেই সময়। ফলে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তীকালে এক্সপ্রেশনিজম, সিম্বলিজম, সুররিয়ালিজম, ফিউচারিজম, কিউবিজম ইত্যাদি অ্যাবসার্ড দর্শন, সাহিত্য ও নাট্য আন্দোলনের জন্ম হয়েছে। আর রিয়ালিজমের মধ্যে থেকে যারা বেরোতে পারেননি, তারা রিয়ালিজমের মধ্যে থেকেই তার মধ্যে কিছু নতুনত্ব এনেছেন যা ম্যাজিক রিয়ালিজম, মাইরেজ রিয়ালিজম, আল্ট্রা রিয়ালিজম, ডার্ক রিয়ালিজম এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের আক্ষেপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটককে ভেঙে বাস্তব বিরোধী যে লেখা লিখেছেন, পরবর্তীতে বাংলা নাট্যকারেরা সে শিক্ষা গ্রহণ করেননি। রবীন্দ্রনাথকে

দূরে সরিয়ে তাঁরা সেই বাস্তবধর্মী নাটকের পথে এগিয়ে চলেছেন 'নবান্ন'-র পথ ধরে। যদিও 'নবান্ন'-র প্রতি তার কোন ক্ষোভ ছিল না। 'নবান্ন' ছিল তাঁর মতে খুব এক্সপেরিমেন্টাল, মূল্যবান নাটক। কিন্তু তিনি মনে করতেন 'নবান্ন'র ধারা আর রবীন্দ্রনাথের নাটক ভাঙা নাটকের খেলা— দুটো পাশাপাশি চললে বাংলা নাটক বেশি উপকৃত হত। 'বহুরূপী', 'রক্তকরবী'র প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে আবিষ্কার করলেও বাংলা নাটকে তার কোন প্রভাব পড়েনি। অথচ সেই সময় পাশ্চাত্য সাহিত্য, শিল্প, নাটক, ছবি abstract রূপ-রীতিকে প্রকাশ করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। তিনি পরিতাপ করে বলেছেন—

> ''তথাপি আমরা নিস্পন্দ। realism-কে জপমালা করে আমরা ধ্যানস্থ ছিলাম এবং আছি। পৃথিবীর যে কোনও নাট্যশিল্পে উন্নত দেশের দিকে তাকালেই দেখা যাবে যেখানে realism অন্তর্মুখী-বিমূর্ততা, সাংকেতিকতা, মায়াবী কল্পনা নাটককে Non-realism-এর দিকে টেনে নিয়েছে। বেকেট থেকে ব্রেশ্‌ট, সকলেই realism-কে বাতিল করেছেন।''[৭]

রিয়ালিজম থেকে পৃথিবীর উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি হলেও তিনি বলেছেন, শুধু এই রিয়ালিজমকে একমাত্র পথ ভাবা ঠিক নয়— ''যে দেশে কেবল একটি রাজপথই আছে, চলাফেরার অন্য কোনও পথ নেই সে দেশ দুর্ভাগা।''[৮]

তাঁর নাটককে অনেকে 'অ্যাবসার্ড বা 'কিমিতি' নাটক বলেছেন, তিনি জানিয়েছেন—

> ''কিমিতি শব্দটা মাথায় আসে শ্যামল ঘোষের। শ্যামল অ্যাবসার্ড নাটক নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বলতে গিয়ে বা লিখতে গিয়ে বলেছে এটাকে আমরা 'কিমিতি' বলছি, এবং অনেক সময় বিজ্ঞাপনও হতো কিমিতিবাদী নাটক হিসেবে। ... এটা কী? পাগলামী নাকি কিম্ভুত কিমাকার একটা কিছু।''[৯]

পরবর্তীতে এই কিমিতি শব্দটা 'অ্যাবসার্ড' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগল। অত্যন্ত জনপ্রিয় হল শব্দটা। কিন্তু তিনি বারবার বলেছেন যে তাঁর নাটকের মধ্যে 'অ্যাবসার্ড' দর্শনের অস্তিত্ব নেই। অ্যাবসার্ড জীবন ভাবনার পরিবর্তে তিনি জীবনমুখী কল্যাণ চিন্তা, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, ও মানবিক দর্শনের জয়গান করেছেন তাঁর নাটকে। তিনি নিজেও বারবার বলেছেন এবং অন্যান্য সমালোচকরাও বলেছেন যে তাঁর নাটকের মধ্যে বাস্তব বিরোধী বিমূর্ততা এসেছে বেশি। কিন্তু তিনি এও বলেছেন যে, এ রকম বললে সবটা বলা হল না। কেননা তাঁর এতটা শক্তি নেই যে তিনি বাস্তবতাকে অস্বীকার করবেন। তিনি বলেছেন—

> ''জীবনের বাস্তবতাকে থিয়েটারের বাস্তবতা করে তুলতে হবে, আমাকে তা করতেই হবে। ... আমি বড় লেখক হই, মাঝারি হই, ছোটো হই, আমাকে ওই বাস্তবতার মধ্যে, জীবনের বাস্তবতার মধ্যে থাকতেই হবে।''[১০]

বাস্তবতা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, যে সাধারণ নিয়মে সব কিছু চলছে, সব কিছু ঘটছে, যে শৃঙ্খলা ছন্দে সবকিছু প্রকাশ পাচ্ছে, যা বহু বছর ধরে সবার কাছে স্বীকৃত তাই বাস্তব। জীবনের বাস্তবতা হল আমাদের আনন্দ, হাসি, কান্না, প্রতিরোধ, লড়াই, ভালোবাসা, তৃপ্তি প্রভৃতি। এগুলোই নানা ঘটনায়

প্রকাশ পায় আমাদের মধ্যে। যাঁরা শিল্পকর্ম করেন তাঁরা এই বাস্তবতার মধ্যে একটা সত্যের অনুসন্ধান করেন, একটা সত্য, সেই সত্য- টাই আসল। সেই truth-টাকেই যদি ধরা যায়, তাহলে এই বাস্তবতা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক লেখার পিছনে যে দর্শন ছিল তা হল— যা নির্জীব তাকে সজীবতা প্রদান, যা নিষ্প্রভ তাকে আলো প্রদান, যা অর্থহীন তাকে তাৎপর্য দান। কিন্তু তিনি মনে করেন সাহিত্য, দর্শনের নতুন করে আর কিছু বলার নেই। বিজ্ঞান নতুন নতুন অনেক সত্যকে এখনো আবিষ্কার করতে পারে, কিন্তু সাহিত্য, দর্শন পারে না। সাহিত্য দর্শনের একটাই কাজ, সেটা হল পুরোনো সত্যকে নতুন করে মনে করিয়ে দেওয়া। একজন নাট্যকারও তাই করে। দর্শকদের মনে পুরোনো জীবন সত্যকে আন্ডারলাইন করে দেয়। নতুন করে পুরোনো সত্যের জন্মান্তর ঘটিয়ে দেয়। তিনি বলেছেন—

> ''একটা আলোড়নের মধ্যে দিয়ে সে অনুভব করে সত্যিটাকে। মানুষের যে প্রবল উচ্চাশা, সে যে কী ধ্বংস নিয়ে আসতে পারে সে তো সত্য কথা— এ আগেও জানতেন, পরেও জানবেন মানুষ। কিন্তু একটা মঞ্চের মধ্য থেকে দর্শককে ক্রমশ শিল্প, নাট্য-শিল্প তাকে সেনসেটিভ করে তোলে, সেই সেনসেটিভনেসের মধ্য দিয়ে সে একটি পরিচিত, জানা সত্য, তার যে প্রবল সত্যের রূপ, মূর্তি, তাকে সে অনুভব করে।''[১১]

ফলে জানা সত্যটাই সে নতুন করে উপলব্ধি করে এবং সেটা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি তার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য শেক্সপিয়রের নাটকের কিছু উদাহরণ তুলে ধরেছেন। যেমন— i. ম্যাকবেথ নাটকের মূল থিম ছিল প্রবল সীমাহীন উচ্চাশার ট্রাজিক পরিণতি। এই থিম বহু যুগ আগে থেকেই সমাজে প্রচলিত। শেক্সপিয়র সেদিক থেকে নতুন কিছু বলেননি। ii. 'ওথেলো' নাটকে এতবড় একটা মহান চরিত্র ওথেলো, কিন্তু তার একটি দুর্বলতা— সে খুব সহজেই অন্য কাউকে বিশ্বাস করে ফেলে। তার বিচার করার ক্ষমতা ছিল না, কোন কিছু কানে শুনেই বিশ্বাস করে ফেলত। মানুষের ফাঁদা পাতে পা দিয়ে অন্ধবিশ্বাসের পরিণতিতে তার প্রিয়তমা ডেসডিমোনাকে নিজের হাতে হত্যা করে। তাই মোহিত চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

> ''রাজা কর্নেন পশ্যতি''-একথা আমাদের বহুবছর থেকে জানা— কিন্তু তবু স্মরণীয়। তবু আমাদের আবেগে আপ্লুত করে, তবু আমাদের ভেতর থেকে চঞ্চল করে তোলে। আমাদের একটা অসীম প্রাপ্তিযোগ ঘটে। এই সমস্ত রচনার মধ্য দিয়ে।''[১২]

থিয়েটারের বাস্তবতা বলতে এটাই বোঝায়। থিয়েটার আর জীবনের বাস্তবতা এক হয়েও এক নয়। থিয়েটার নাট্যকারের বানানো গল্প, চরিত্র, ঘটনা দর্শকের সামনে নানা আঙ্গিকে উপস্থাপন করে। চরিত্ররা নিজেদের বাস্তব জীবন ভুলে গিয়ে, নিজেদের বাস্তব আইডেন্টিটি ভুলে গিয়ে রাজা, রানি, প্রজা, খলচরিত্র, কমেডিয়ান সেজে অভিনয় করে। তাদের সমস্তটাই মিথ্যা। কিন্তু এই মিথ্যার মধ্য দিয়েই নাট্যকার সত্যটাকে ধরিয়ে দেন, তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলেন।

তিনি মনে করেন থিয়েটারের বাস্তবতা ও জীবনের বাস্তবতা এক হয়েও ভিন্ন। থিয়েটার জীবনের

অতিরিক্ত কিছু। থিয়েটারের সঙ্গে বাস্তব জীবনের গল্প মিললেও বাস্তব যেটা মানুষ পায় না, সেটাই সে থিয়েটারে দেখতে আসে। তিনি বলেছেন—

> "...Something added to nature, কিছু যোগ করা হবে। জীবন যেরকম তার সঙ্গে কিছু যোগ করা হবে। সেই যোগটা যদি করা যায় সঠিকভাবে, তবেই সেটা শিল্প হবে। আমি যোগ করব কেন? কারণ শিল্প Larger than life। জীবনের থেকে অনেক বেশি Larger। এই কারণেই তার কিছু সহায়ক দরকার পড়ে। সেই সহায়কটাই হচ্ছে Something added to nature...সেই ঘটনার সঙ্গে নাটকের সঙ্গে একটা কিছু যুক্ত করতে হবে যেটা শিল্প, যেটা ভাবনা, যেটা বিদ্ধ করার ক্ষমতা, যেটা রীতি, যেটা বিষয়গত মূল বিন্দুকে বিস্ফোরিত করে তোলে— treatment-এর মধ্য দিয়ে এসব করতে হয়।"[১৩]

শিল্প বাস্তবের থেকেও মহৎ। বাস্তবকে শিল্প হয়ে উঠতে হলে শুধু নতুন কিছু যোগ করলেই চলবে না। আরেকটা জিনিস তিনি যোগ করতে বলেছেন সেটা হল magic। এই magic তিনি এই অর্থে বলেছেন যে, যা তিনি তাঁর নাটকের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত করবেন সেখানেই তিনি magic আনবেন। তিনি বলেছেন—

> ''এই ম্যাজিকটাই তার চেনা জগতের চেনা বিষয়ের মধ্যে একটা জাদুকরী মায়া সঞ্চার করে দেবে— তার লেখন প্রণালীর মধ্য দিয়ে কিংবা তার প্রয়োগকর্তা মঞ্চে যখন উপস্থাপন করবেন তাঁর প্রয়োগ প্রণালীর মধ্য দিয়ে একটা জাদু তিনি তৈরি করবেন, যা সম্মোহিত করে, যা বিস্ময়কর বলে মনে হয়, যা অদ্ভুত বলে মনে হয় এবং বহুলভাবে তাঁকে প্লাবিত করে, তাঁকে আচ্ছন্নও করে। এমন একটা ম্যাজিক তার মধ্যে থাকে।"[১৪]

এই ম্যাজিকটা এক একজন নাট্যকার নিজেদের মতো করে সৃষ্টি করেছেন। শেক্সপিয়র, মলিওর, ইবসেন, ব্রেশট প্রত্যেকেই নিজের মতো করে ম্যাজিক সৃষ্টি করে ব্যবহার করেছেন। নাটকের মধ্যে এই ম্যাজিকের অভাব ঘটলে তার মধ্যে আর কোন আকর্ষণ থাকে না। এই ম্যাজিকটা ব্যাখ্যা করে বোঝানো অসম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। কিন্তু তার মধ্যে ম্যাজিক থাকতে হবেই। এই ম্যাজিকটা নাটকের মধ্যে নতুন তাৎপর্য তৈরি করে। শুধু নাট্যকারকে ম্যাজিসিয়ান বা যাদুকর হলে চলবে না। যাদু দেখাতে হবে নির্দেশক ও প্রয়োগকর্তাকেও। একমাত্র তখনই ম্যাজিকের স্পর্শে শিল্প হয়ে উঠবে সুন্দর।

সময় যত এগোচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রা আরও জটিল হচ্ছে। ফলে চিন্তা, অনুভূতি, বোধের জগতেও জটিলতা আসছে। তাই শুধুমাত্র রিয়ালিজমের মাধ্যমে সম্পূর্ণ মানুষকে ধরা যাচ্ছে না। রিয়ালিজম শুধুমাত্র সারফেস রিয়ালিটিকেই ধরতে পারছে, কিন্তু ইনার রিয়ালিটিকে ধরতে পারছে না। ফলে অর্ধেক মানুষকে আমরা বাস্তবধর্মী নাটকে পাচ্ছি। অথচ আইসবার্গের মতো মানুষের বাকি অর্ধেক অংশ থেকে যাচ্ছে জলের তলায়। এই জলের তলার অংশটা অর্থাৎ ইনার রিয়ালিটিকে দেখানোর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

তিনি মনে করেন, আমাদের জীবন শুধু বাস্তবকে আশ্রয় করেই বেঁচে নেই— ফ্যান্টাসি,

দেশি-বিদেশি রূপকথাও তার দরকার। একটি শিশু রূপকথার জগতের মধ্যে বাঁচে আর যৌবন বাস্তব ছাড়িয়ে স্বপ্নে, কল্পনায় বাঁচে, আর বয়স হলে সে ঈশ্বরকে ডাকে। ঈশ্বরের মধ্যে বাস্তব সত্যতা নেই, আছে বিমূর্ত সত্য। বাস্তববিরোধী ঈশ্বরকেও মানুষ সত্য বলে মানে। দেবদেবীর দশটা হাত, তিনটা মাথা অতিবাস্তব বা অবাস্তব। কিন্তু যখন আমরা এর মধ্যে অর্থ আরোপ করি তখনই সেটা নতুন তাৎপর্য নিয়ে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়। কোন কিছুর বাহ্যিক রূপটাই শেষ কথা নয়, তাকে অর্থপূর্ণ করে তোলাটাই মূল কথা। বাইরের চেহারাটা বাস্তব হতে পারে আবার অবাস্তবও হতে পারে।

বাস্তববাদী নাটকের রূপ, আঙ্গিক, বিষয়, চরিত্র, দর্শন, চেতনা সমস্ত কিছু ভেঙে তিনি যে নাটকের কথা বলেছেন সে নাটককে তিনি ছন্নছাড়া বলেছেন। কিন্তু এই নাটক ছন্দছাড়া নয়। তিনি বলেছেন—

> ''এর নিজস্ব ছন্দ, যুক্তি, গঠন, তাল, লয়, সবই হবে নাট্যসম্মত, কিন্তু প্রথাসিদ্ধ ব্যাকরণ মেনে নয়। রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটকে পঞ্চক যেমন কার যেন ডাক শুনতে পেয়েছিল, সে ডাক নিয়ম মানার ডাক নয়, নিয়ম ভাঙার ডাক। এই নাটকও আসবে এই নিয়ম ভাঙার ডাক শুনে, তাই এই নাটকের সঙ্গে মিলবে না অন্য নাটক। এ নাটক ঘর-ছাড়া, খেয়ালখুশিতে বল্গাহারা— এ নাটক ছন্নছাড়া। একি তবে পাগলামি? খানিক পাগলামিতো বটেই। তবে এ পাগলামি হৃদপিণ্ডে একটা সতেজ স্পন্দন জাগায়, মস্তিষ্কের জলবায়ুতে ঘটে রূপান্তর।''[১৫]

মোহিত চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

> ''কেবলমাত্র creative freedom-এর উল্লাস, নিজস্ব প্রকাশ ভঙ্গীর আবিষ্কার, বা শিল্পের কারুকার্য রচনার জন্যেই তো লিখতে চাই না। ...''[১৬]

মানুষ এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার তাগিদেও তিনি লিখতেন। তিনি গভীর পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি দিয়ে বাস্তব সমাজ রাষ্ট্রকে চিনতে চেয়েছিলেন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন বর্তমান সময়ে সমাজের বেশিরভাগ মানুষই অসুখী, অভাব, অভিযোগ, অশান্তি, হতাশা, ব্যর্থতা, অসহায়তা ও আশাহীনতায় দিন যাপন করছে। তাই মানুষকে আন্দোলিত করার জন্য, বিধ্বস্ত জীবনকে সতেজ, সুন্দর, সজীব করার জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। তিনি মনে করতেন সঠিক রাজনীতিই পারে মানুষকে বাঁচাতে, সমাজকে নবচেতনায় উদ্দীপিত করতে আর সেই সঙ্গে শিল্প-সংস্কৃতির চর্চাকেও তিনি সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

তিনি একবার জানিয়েছিলেন—

> ''আমি যখন 'তখন বিকেল' লিখি তখন আমার এক marxist বন্ধু আমাকে চিঠি লেখেন... নাটক আমাকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু এই নাটকটা আজকের সমস্যাকে কোনো দিক থেকে reflect করে না ... আমি এর উত্তরে বলতে চাই, আমি রাজনৈতিক সমস্যার কথাও বলব, আবার এ নাটকও করব। আমি এখানে বলেছি যে, মানুষ যখন বুড়িয়ে যায়, তখন তার মধ্যে একটা নির্বেদ আসতে পারে। তার মনে হতে পারে, পৃথিবী থেকে সমস্ত সৌন্দর্য হারিয়ে গেছে। বেঁচে থাকা এখন যেন কেবল নিজেকে টেনে টেনে নিয়ে চলা। ফুরিয়ে

আসছে, এইরকম মনে হয়, বিষন্নতা জাগে ... তখন আমার মনে হতে লাগল, এই ধরনের মানুষকে ভরসা দেওয়ার দরকার আছে। এ সমস্যা আমার ব্যক্তিগত নয়। এ বয়সে মানুষ পৌঁছবেই। এটা জীবনের সমস্যা।"[১৭]

মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পর্বের নাটক 'সিংহাসনের ক্ষয়রোগ', 'রাজরক্ত', 'ক্যাপ্টেন হুর্‌রা', 'মহাকালীর বাচ্চা', 'মাছি' প্রভৃতি নাটকে প্রতিবাদী, সংগ্রামী, বিপ্লবী চেতনার প্রকাশ আছে। কিন্তু তিনি কখনো সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে মিটিং, মিছিল, সভা, সমিতিতে যাননি, লাল পতাকা হাতে নেননি। তিনি মার্কসীয় আদর্শ জীবনে, ধ্যানে, জ্ঞানে, মনন, চিন্তনে , বিশ্বাসে ও সৃজনে ধারণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন নাটকের জন্য নিবেদিত প্রাণ। নাটক নিয়ে তিনি বহুবার মিটিংএ উপস্থিত থেকেছেন, মিছিলে হেঁটেছেন, নাট্যসভায় বহু ভাষণ দিয়েছেন। জীবন সায়াহ্নে এসে অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি মিছিলে হেঁটেছেন। নাটক নিয়ে ভাষণে তিনি একবার বলেছিলেন—

''এখন সুসময় নয়— অস্থির অশান্ত পরিবেশ। মানবিকতা আক্রান্ত, বিবেকবর্জিত হিংসা খড়্গহস্ত, অসত্য দাম্ভিক গর্জনে উচ্চকণ্ঠ, অগ্রগতি প্রতিবন্ধকতায় বিচলিত। এ-সময় নাটকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নাটকের মধ্যে একটা দুর্জয় প্রাণশক্তি আছে— কয়েক হাজার বছর আগের জন্মকাল থেকে নানা প্রতিকূল অবস্থা ও বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তা সদর্পে বেঁচে আছে। নাটক সংকটকে বিশ্লেষণ করে এবং তার গ্রাস থেকে উদ্ধারের সংকেতও দেয়। নাটক মনে করিয়ে দেয় মানুষ কীভাবে মিলেমিশে বলবান হয়ে উঠতে পারে, নাটক শিখিয়ে দেয় বিষাদ সরিয়ে আমরা কীভাবে হেসে উঠতে পারি, নাটক ঘোষণা করে অন্যায় শেষ পর্যন্ত পরাজিত হতে বাধ্য।"[১৮]

মোহিত চট্টোপাধ্যায় একজন লেখককে সমাজ সচেতনতা ও রাজনীতি সচেতনতার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আর এই সচেতনতাই সমাজ-জীবনকে বদলে দেওয়ার চেষ্টা করে, বদলে দেয়। ফলে মানুষ শান্তি ও স্বাচ্ছন্দের মধ্যে দিয়ে আনন্দ লাভ করতে পারে। আদর্শ লেখকদের তাই তিনি মানুষ ও সমাজের বিবেকের ভূমিকায় দেখতে পান। 'বিবেক বোধ সঞ্জাত' রাজনীতির কথা প্রচার করতে বলেন। যে লেখায় বৃহত্তর মানব সমাজের কল্যাণ চিন্তা নেই, তাকে তিনি সঠিক বলে মনে করতেন না। তাই তিনি বলেছেন—

''আমি বুঝি, আমি এমন ক্ষমতাবান লেখক নই যে, আমার লেখার মধ্য দিয়ে মানুষের দুরবস্থা বদলে দিতে পারব। তাই বলে কর্তব্যই বা ভুলি কি করে? তাই আমি সীমিত ক্ষমতা নিয়েও লিখে যেতে চাই মানুষের হয়ে, মানুষের জন্য।"[১৯]

তথ্যসূত্র:

১. অরণ্যের শ্বাসকষ্ট, কবিতা সংগ্রহ। মোহিত চট্টোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩। পুস্তক

বিপণি। কলকাতা। পৃ. ১৮৭।
২. প্রমা। মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা ২০১৩। অতিথি সম্পাদক শুভঙ্কর রায়। প্রকাশ ২০১৩। কলকাতা। পৃ. ৭
৩. নাট্য-ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি। ড. অপূর্ব দে। প্রথম প্রকাশ ৬.৬.২০১২। দিয়া পাবলিকেশন। কলকাতা। পৃ. ২৯
৪. প্রমা। মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা ২০১৩। অতিথি সম্পাদক শুভঙ্কর রায়। প্রকাশ ২০১৩। কলকাতা। পৃ. ৮
৫. মোহিত চট্টোপাধ্যায়। নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৬। নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন। কলকাতা। পৃ. ১৫৭
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
৭. মোহিত চট্টোপাধ্যায়। নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৬। নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন। কলকাতা। পৃ. ১০।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
৯. অনুষ্টুপ। সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক। ৩৮ তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা। ১৪১১। সম্পাদনা দেবাশিস সেনগুপ্ত। কলকাতা। পৃ. ১০০।
১০. রঙ্গপট নাট্যপত্র ২০১২। মোহিত চট্টোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা। সম্পাদক ড. তপনজ্যোতি দাস। কলকাতা। পৃ. ৯৫।
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।
১২. রঙ্গপট নাট্যপত্র ২০১২। মোহিত চট্টোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা। সম্পাদক ড. তপনজ্যোতি দাস। কলকাতা। পৃ. ৯৬।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।
১৫. মোহিত চট্টোপাধ্যায়। নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ। প্রথম প্রকাশ বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৬। কলকাতা। পৃ. ৩১।
১৬. প্রমা। মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা ২০১৩। অতিথি সম্পাদক শুভঙ্কর রায়। প্রকাশ ২০১৩। কলকাতা। পৃ. ১৭
১৭. রঙ্গপট নাট্যপত্র ২০১২। মোহিত চট্টোপাধ্যায় স্মরণ সংখ্যা। সম্পাদক ড. তপনজ্যোতি দাস। কলকাতা। পৃ. ৩৭৭।
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।
১৯. প্রমা। মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা ২০১৩। অতিথি সম্পাদক শুভঙ্কর রায়। প্রকাশ ২০১৩। কলকাতা। পৃ. ২০